প্রথম আলো

তারিখ 12 DEC 2017
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৪

শিক্ষা, পরীক্ষা ও কোচিং সেন্টার

সহজিয়া কড়চা

সৈয়দ আবুল মকসুদ

স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত যাঁরা বাংলাদেশ চালাচ্ছেন, সেই রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী, সংসদ সদস্যদের প্রায় সবাই উচ্চশিক্ষিত, তাঁরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেছেন, কিন্তু তাঁদের কেউই কোনো কোচিং সেন্টারে পড়েননি। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, কূটনীতিবিদ কঠিন প্রতিযোগিতা করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে তাঁদের প্রচুর বইপত্র পড়তে হয়েছে, কিন্তু কোচিং সেন্টারে যাতায়াতের প্রয়োজন হয়নি। বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন যাঁরা উপাচার্য ও জ্যেষ্ঠ শিক্ষক, তাঁরা কোচিং সেন্টারের সাহায্যে উচ্চশিক্ষা নিয়েছেন এমনটি শোনা যায় না। দেশের যাঁরা প্রথিতযশা বিজ্ঞানী, কৃষিবিদ, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, স্থপতি, প্রযুক্তিবিদ, অর্থনীতিবিদ, তাঁরা বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কর্মজীবনে কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছেন। তাঁদের কোনো কোচিং সেন্টারের দ্বারস্থ হতে হয়নি। দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের কোচিং সেন্টারে যাওয়ার দরকার হয়নি। ১৫-২০ বছর আগে দেশে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, কিন্তু দু-চারটি ছাড়া কোনো কোচিং সেন্টার ব্যবসার প্রকোপ ছিল না।

কোনো জনগোষ্ঠী স্বাধীন হতে চায় স্বাবলম্বী, শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে; স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ের চেয়ে অধঃপতিত ও দুর্বল হওয়ার জন্য নয়। শক্তিশালী জাতি গঠিত হয় সুশিক্ষিত ও পরিশ্রমী মানুষের দ্বারা। সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীই উন্নত সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে পারে। মানসম্মত শিক্ষা ছাড়া সুশিক্ষিত হওয়া সম্ভব নয়।

১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার এ দেশে পাশ্চাত্য পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করে। তার আগে যে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল, তা খারাপ বা মানহীন ছিল তা বলা যাবে না। ভারতবর্ষ ও কনফুসীয় চীন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা দুর্বল হলে মহান সভ্যতা সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। তবে ইংরেজরা যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করে, তার মানও উঁচু এবং আধুনিক যুগের জন্য বিশেষ উপযোগী। ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ইংরেজরা চলে গেলেও সেই ধারার শিক্ষাব্যবস্থাই আজও রয়ে গেছে। পলাশীর যুদ্ধ-পূর্ব শিক্ষাব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার আর কোনো সুযোগ নেই। বরং প্রচলিত ব্যবস্থাকেই কীভাবে আরও উন্নত করা যায়, সেই চেষ্টাই হওয়া উচিত। কিন্তু অবস্থা দাঁড়িয়েছে বিপরীত। ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় যে জিনিসগুলো ছিল খুবই ভালো ও উপযোগী, আমরা ধীরে ধীরে সেগুলো খুইয়েছি। এখন আমরা কোন পদ্ধতিতে আছি তা এই পদ্ধতির প্রবর্তনকারী ও সমর্থকেরা ছাড়া আর কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

১৯৭০ সালে বাংলাদেশের যত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজ ছিল, আজ কোচিং সেন্টারের সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশি। আজ ঢাকা ও অন্যান্য বড় শহর এবং উপজেলা পর্যায়ে বড়, মাঝারি ও ছোট কোচিং সেন্টারের সংখ্যা প্রায় ২ লাখ। গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রতিবেদনে জানা যায়, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা সাড়ে ৫ কোটি। তাদের প্রায় ৭৮ শতাংশ—৪ কোটি ২৪ লাখ ছাত্রছাত্রী কোচিং সেন্টার থেকে সবক নেয়। কোচিং সেন্টারগুলো রাষ্ট্রের কোন কর্তৃপক্ষের অধীন তা কেউ জানে না।

কোচিং সেন্টারগুলো কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়, তারা কোনো দানপত্র খুলে বসেনি ছাত্রছাত্রীদের বিনা পয়সায় জ্ঞান দান করার জন্য। মূল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বেতন ফি যা-ই হোক, কোচিং সেন্টার থেকে যে বিদ্যাদ্রব্য কেনা হয়, তা চড়া দামে। ২ লাখ কোচিং সেন্টারে বছরে ৫০ হাজার কোটি টাকা লেনদেন হয় বলে পত্রপত্রিকা থেকে জানা যায়।

কোচিং সেন্টারগুলোর মালিকানা কাদের? বেসরকারি অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শুধু নন, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের অনেকে কোচিং বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত। এ এমন এক ব্যবসা যে বড় বড় কোচিং সেন্টারের মালিকদের আয় একজন মাঝারি শিল্পপতির আয়ের চেয়ে বেশি। তবে শিল্পোদ্যোক্তাদের সঙ্গে কোচিং সেন্টারের মালিকদের তফাত হলো শিল্পমালিকদের লোকসানে পড়ার ঝুঁকি থাকে, কোচিং সেন্টারের মালিকদের লোকসানের কোনো ব্যাপার নেই।

স্কুল-কলেজের বাইরে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ার প্রচলন ৩০-৪০ বছর আগে পর্যন্ত ছিল। যে ছেলে বা মেয়ে অঙ্ক বা ইংরেজিতে কাঁচা অথবা কোনো বিষয়ে আরও ভালো করতে চায়, অভিভাবকের সংগতি থাকলে তাঁর জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হতেন। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অসচ্ছল মেধাবী ছাত্রদের কেউ কেউ গৃহশিক্ষকের কাজ করে কিছু রোজগার করতেন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে দেখেছি, স্কুলের ওপরের শ্রেণির কোনো ছাত্রীকে সন্ধ্যাবেলা পড়াতে গিয়ে চিরকুট চালাচালি করে এবং প্রেম নিবেদনে প্রত্যাখ্যাত হয়ে নিজের পড়াশোনার ক্ষতি করেছেন। তবে গৃহশিক্ষকতা করতে গিয়ে ভাগ্যবানদের কেউ কেউ গৃহকর্তার জামাতা হিসেবে প্রমোশন পর্যন্ত পেয়েছেন। কোনো কোনো অঙ্ক বা ইংরেজির শিক্ষক বাড়িতে সীমিত পরিসরে প্রাইভেটও পড়িয়েছেন। ওসবের মধ্যে বাণিজ্যের ব্যাপার ছিল না।

কোনো কার্যই কারণ ছাড়া হয় না। কোচিং সেন্টারের উদ্ভব ও বিকাশও উপযুক্ত কারণেই ঘটেছে। পড়ালেখার জন্য রয়েছে রাষ্ট্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রয়েছে পাঠ্যবই এবং শিক্ষকেরা। তার বাইরে আরেক শ্রেণির বিদ্যাদ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্রের প্রয়োজন কেন? ওগুলোর প্রয়োজন হচ্ছে পরীক্ষার জন্য। বিদ্যা অর্জন না করে কী উপায়ে পরীক্ষায় বেশি নম্বর ছিনতাই করে নেওয়া যায়, তার অপূর্ব কলাকৌশল শেখানো হয় সেখানে। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিই জন্ম দিয়েছে ওই সব বিদ্যাদ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্রের।

যেখানে পরীক্ষা আছে, সেখানে প্রশ্নপত্রও আছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে পরীক্ষার সম্পর্ক শত শত বছর আগেও ছিল। ইউরোপে ছিল, ভারতবর্ষেও ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের আগে এ দেশে মাদ্রাসাছাত্রদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হতো। সংস্কৃত টোল ও চতুষ্পাঠীর শিক্ষার্থীদের কঠিন পরীক্ষা ছিল।

শিক্ষার্থীকে তার যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতেই হবে। কিন্তু পরীক্ষা জিনিসটি কী এবং কী তার উপযোগিতা, তা নিয়ে হাজার বছর কোনো গবেষণা হয়নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে যিনি পরীক্ষা বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তিনি স্যার ফিলিপ জোসেফ হার্টগ, স্যার পি জে হার্টগ নামে খ্যাত। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য। এই মহান শিক্ষাবিদ, উচ্চশিক্ষা সংগঠক ও শিক্ষা দার্শনিকের জীবনী লিখতে গিয়ে (স্যার ফিলিপ হার্টগ, প্রথমা প্রকাশন) দিল্লির জওহরলাল নেহরু লাইব্রেরি ও মিউজিয়ামে তাঁর *অ্যান এক্সামিনেশন অব এক্সামিনেশনস (১৯৩৫)* এবং *দ্য মার্কস অব এক্সামিনেশনস (১৯৩৬)* পাঠ করি। ৮০ বছর আগের পরীক্ষাবিষয়ক তাঁর পর্যবেক্ষণ আজও প্রাসঙ্গিক।

উপমহাদেশের সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে স্যার ফিলিপ হার্টগ শিক্ষাদান ও পরীক্ষাপদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করে বই লিখেছেন। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিষয়েও গবেষণা করেছেন। কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁস বলে কিছু যে কখনো হতে পারে, সে কথা তাঁর মাথায় আসেনি এবং ৬০ বছরের মধ্যে পরীক্ষা যে একটি প্রহসনের ব্যাপারে পরিণত হতে পারে, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি।

পাবলিক পরীক্ষার সংখ্যা যত বাড়বে, পাড়ায় পাড়ায় তত গজিয়ে উঠবে কোচিং সেন্টার। ছিল এসএসসি, এইচএসসি, স্নাতক; তাতেই ছাত্রছাত্রীরা কূলকিনারা পাচ্ছিল না, যোগ হলো আরও ছোটদের পিএসসি, জেএসসির যন্ত্রণা। হয়তো খুব শিগগির চালু হবে কেএসসি বা কিন্ডারগার্টেন স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা দুগ্ধপোষ্যদের জন্য। ব্যবস্থাটা এমন হয়ে গেছে যে ছেলেমেয়েদের পাবলিক পরীক্ষায় ভালো ফল করতে হলে গাইড বই ও কোচিং সেন্টারের দ্বারস্থ না হয়ে উপায় নেই। বিদ্যা অর্জন নয়, যেকোনোভাবে পরীক্ষায় বেশি নম্বর পেতে হবে, তা অবৈধ উপায়ে হলেও। কোচিংয়ে দৌড়াদৌড়ি করে ছেলেমেয়েরা করছে কষ্ট আর অভিভাবকেরা পড়ছেন অর্থকষ্টে। তবে শিক্ষার্থীরা কষ্টই করছে, পরিশ্রম করছে না। কষ্ট আর পরিশ্রম দুই জিনিস। আগে ফটোকপি মেশিন ছিল না, আমরা বসে বসে বই দেখে নোট করতাম। এখন কোচিং কেন্দ্রের কেউ একজন একটি নোট তৈরি করে, বাকি কাজটুকু করে ফটোকপি মেশিন। ছাত্রের কিছুই করা লাগে না। কোচিংয়ের ওপর নির্ভরতায় অপদার্থ প্রজন্ম তৈরি হবে, যারা জাতিকে কিছুই দিতে পারবে না। অথচ দেশের অন্তত ৫০ শতাংশ শিশু গড়পড়তা যথেষ্ট মেধাসম্পন্ন। কোচিং-নির্ভরতায় সেই মেধার সদ্ব্যবহার হচ্ছে না।

পত্রপত্রিকায় লেখালেখির কারণে বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নজরে আসে। ২০১২ সালে কোচিং-বাণিজ্য বন্ধের নীতিমালা প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করে। তাতে বলা হয়েছিল, সব বিষয়ের জন্য বিদ্যালয়ভিত্তিক কোচিং ফি ১ হাজার ২০০ টাকার বেশি হবে না। কিন্তু সেই নীতিমালা মানা হচ্ছে না। একশ্রেণির শিক্ষকের নৈতিকতার মান নিচে নেমে গেছে। দুর্নীতিতে তাদের অরুচি নেই। প্রযুক্তিও তাদের হয়ে কাজ করে। প্রশ্নপত্র ফাঁস করার অত্যাধুনিক প্রযুক্তি হাতের মুঠোয়। যাঁরা প্রশ্নপত্র তৈরি ও পরীক্ষা গ্রহণের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা সৎ হলে প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রশ্নই আসে না। এসব অপরাধের সঙ্গে সব নয়, তবে বহু কোচিং সেন্টার যুক্ত।

কোচিং সেন্টারের অপকর্মের বিষয় দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) নজরেও আসে। তাদের তদন্ত দল কোচিং বাণিজ্যের দুর্নীতি খুঁজে পায়। দুদকের প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই ঢাকা নগরীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাড়ে ৬০০ শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে, গত মাসে ২৪টি সরকারি বিদ্যালয়ের ৫২২ জন শিক্ষককে কোচিং-বাণিজ্যে যুক্ত থাকার অভিযোগে বদলির সুপারিশ করেছে দুদক। ভালো উদ্যোগ, তবে কতটা বাস্তবায়িত হয় তা দেখার বিষয়।

কোনো জাতির শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজই ভরসা, মধ্য আয়ের মানুষেরা নয়। যুগের সমস্যা মোকাবিলায় নতুন মানুষ তৈরি হয় শিশুদের মধ্য থেকেই। উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত জীবনবোধ তাদের মধ্যে সঞ্চারিত না করলে আগামী প্রজন্মের পর প্রজন্ম বেঁচেবর্তে থাকবে, কিন্তু টিকে থাকবে না। অসাধু পন্থায় কৃত্রিম বিদ্যা শিখে যুগ সংকট মোকাবিলায় অসমর্থ মানুষ টিকে থাকতে পারে না।

● সৈয়দ আবুল মকসুদ: লেখক ও গবেষক।